পরিশিষ্ট

গাউছুল আজম

হযরত বড়পীর আব্দুল কাদের জিলানী (রহঃ)-এর জীবনালেখ্য

সহৃদয় পাঠক পঠিকা! "আল্‌ফাতহুর" রাব্বানী নামক এই জগদ্বিখ্যাত গ্রন্থটির যিনি রচয়িতা তাঁহার নাম হযরত আবদুল কাদের জিলানী (রহঃ)। আর তাঁহার পরিচয় মাহবুবে সুবহানী, কুতুবে রাব্বানী পীরানে পীর দস্তেগীর গাউছুল আজম হযরত বড় পীর (রহঃ) তাঁর সম্পর্কে এতটুকু বিষয় মাত্র জানা থাকিলেও তিনি এই জগতের বুকে আল্লাহ পাকের কোন্ পর্যায়ের বান্দা ছিলেন এবং দুনিয়াতে কোন নবী রাসূল হিসাবে আগমন না করিলেও তাঁহার ব্যক্তিত্ব, ব্যক্তিসত্তা, কৌলীণ্য, আভিজাত্য, মর্যাদা, গৌরব, কঠোর সাধনা, যোগ্যতা, শিক্ষা-দীক্ষা, জাহেরী ও বাতেনী ইলমে পারদর্শিতা, মানব সমাজে দীনের খেদমত, সর্বোপরি আল্লাহর নৈকট্য তাঁহার কোন্ স্তরের ছিল তাহা জানার জন্য সকলেরই গভীর আগ্রহ থাকা একান্তই স্বাভাবিক। মানুষের সেই স্বাভাবিক আগ্রহ নিবৃত্তির লক্ষ্যেই আমরা হযরত গাউছুল আজমের জীবনের কতিপয় সমধিক উল্লেখযোগ্য অংশ এখানে উল্লেখ করিলাম। যাহার জীবনেতিহাসের সম্যক বিষয় জানিতে পারিলেও আশা করি আল্লাহ পাকের সেই শ্রেষ্ঠ বান্দার মহা মর্যাদার বিষয় কিছুটা ধারণা করা সকলের পক্ষেই সম্ভব হইবে।

পিতার বংশ ধারা

আবদুল কাদের জীলানী (রহঃ)-এর পিতার নাম (১) হযরত সাইয়্যিদ আবু সালেহ মূসা (রহঃ), তাহার পিতার নাম (২) হযরত সাইয়্যেদ আবু আবদুল্লাহ (রহঃ), তাহার পিতার নাম (৩) হযরত সাইয়্যেদ ইয়াহইয়া জাহেদ (রহঃ), তাহার পিতার নাম (৪) হযরত সাইয়্যেদ মোহাম্মদ (রহঃ), তাহার পিতার নাম (৫) হযরত সাইয়্যেদ দাউদ (রহঃ), তাহার পিতার নাম (৬) হযরত সাইয়্যেদ মূসা সানী (রহঃ), তাহার পিতার নাম (৭) হযরত সাইয়্যেদ আবদুল্লাহ সানী (রহঃ), তাহার পিতার নাম (৮) হযরত সাইয়্যেদ মূসা আল জোহন (রহঃ), তাহার পিতার নাম (৯) হযরত সাইয়্যেদ আবদুল্লাহ আল-মহজ (রহঃ), তাহার পিতার নাম (১০) হযরত সাইয়্যেদ হাসান মোসান্নাহ (রহঃ), তাহার পিতার নাম (১১) হযরত সাইয়্যেদ হাসান (রাঃ), এবং তাহার পিতার নাম (১২) শেরে খোদা হযরত আলী মোর্তজা (রাঃ),। আল্লাহ তাহাদের উপর রহম ও করম দান করুন।

মাতার বংশ ধারা

হযরত সাইয়্যেদ বড় পীর আবদুল কাদের জিলানী (রহঃ)-এর মাতৃকুলের বংশসূত্র নিম্নরূপ ঃ

হযরত বড়পীর আবদুল কাদের জীলানী (রহঃ)-এর মাতার নাম (১) সাইয়্যেদা উম্মুল খায়ের ফাতেমা (রহঃ), তাহার পিতার নাম (২) হযরত আবদুল্লাহ সাউমেয়ী (রহঃ), তাহার পিতার নাম (৩) হযরত সাইয়্যেদ আবু জামাল (রহঃ), তাহার পিতার নাম (৪) হযরত মোহাম্মদ (রহঃ), তাহার পিতার নাম (৫) হযরত আবু আতা আবদুল্লাহ (রহঃ), তাহার পিতার নাম (৬)

হযরত আবু আলাউদ্দিন (রহঃ), তাহার পিতার নাম (৭) হযরত আলী জওয়াদ (রহঃ), তাহার পিতার নাম (৮) আলী রেজা (রহঃ), তাহার পিতার নাম (৯) হযরত মূসা কাজেম (রহঃ), তাহার পিতার নাম (১০) হযরত ইমাম জাফর সাদেক (রহঃ), তাহার পিতার নাম (১১) হযরত ইমাম বাকের (রহঃ), তাহার পিতার নাম (১২) হযরত ইমাম জয়নুল আবেদীন (রহঃ), তাহার পিতার নাম (১৩) হযরত ইমাম হোসেন (রাঃ) এবং তাহার পিতার নাম (১৪) হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু।

এই ক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয় বিষয় হইল যে, হযরত আবদুল কাদের জীলানী (রহঃ) পিতৃকুলের দ্বাদশতম সূত্র এবং মাতৃকুলের চতুর্দশতম সূত্র শেরে খোদা হযরত আলী মোর্তজা (রাঃ)-এর সহিত মিলিত হইয়াছে।

পিতা-মাতার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

জগদ্বিখ্যাত সাধক হযরত আবদুল কাদের জীলানী (রহঃ)-এর পিতা সাইয়্যেদ আবু সালেহ মূসা (রহঃ), হযরত ইমাম হাসান (রাঃ)-এর বংশধর ছিলেন। তিনি একজন বিশিষ্ট পুণ্যবান, কামেল এবং বুজুর্গ ব্যক্তি ছিলেন। সচ্চরিত্রতা ও আল্লাহ প্রেমের বিবিধগুণ তাহার মধ্যে বিরাজমান ছিল। বড়পীর (রহঃ)-এর জননী উম্মুল খায়ের ফাতেমা (রহঃ) ছিলেন ইমাম হোসেন (রাঃ)-এর বংশধর এবং একজন পুণ্যশীলা, পরম ধার্মিকা ও পর্দানশীলা মহিলা। সুতরাং তাহারা বাল্যকাল হইতেই পবিত্র শরীয়তের আদেশ-নিষেধসমূহ ও নিয়মাবলী পরিপূর্ণভাবে পালন করিয়া চলিতেন। ভালমন্দ, হালাল ও হারামের প্রতি তাহাদের দৃষ্টি ছিল অত্যন্ত সতর্ক। বড়পীর আবদুল কাদের জীলানী (রহঃ)-এর পিতা-মাতা কিরূপ মহৎ ও নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী ছিলেন এবং তাহাদের চরিত্র মহত্ত্ব, গুণাবলী ও পবিত্রতা কি অপূর্ব ও অচিন্তনীয় তাহা একটি বহুজন বিদিত জনশ্রুতি হইতেই উপলব্ধি করা যায়।

জনশ্রুতিটি এইরূপ ঃ

বড়পীর সাহেবের ধর্মপ্রাণ সুযোগ্য পিতা আবু সালেহ মূসা জঙ্গী (রহঃ) প্রৌঢ়ত্বের প্রায় শেষ প্রান্তে আসিয়া উপনীত হইয়াছেন। খোদা প্রেম ও আল্লাহ পাকের অক্লান্ত সাধনায়ই তাহার জীবন অতিবাহিত হইয়া চলিয়াছে। তখনও তিনি দার পরিগ্রহ করেন নাই। একদা তিনি ফোরাত নদীর তীর ধরিয়া কোন দূরবর্তী স্থানে রওয়ানা হইয়াছিলেন। দুর্গম পথ অতিক্রম করিতে কিছু দিন অতিবাহিত হইবার পর তাহার প্রয়োজনীয় রসদ-পত্র এবং পাথেয় দ্রব্যসামগ্রীসমূহ নিঃশেষ হইয়া গেল। নানা বিপদ ও সংকট তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিল।

মাথার উপরে দ্বিপ্রহরের প্রখর সূর্য। তিনি পথশ্রম, ক্ষুধা-তৃষ্ণা ও দুর্ভাবনায় নিতান্তই কাতর পইয়া পড়িলেন এবং নদীর তীরবর্তী দিগন্ত বিস্তৃত একটি পল্লবঘেরা বৃক্ষের ছায়ায় বসিয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রাম লাভ করিতে লাগিলেন। মনে তাহার নানা ভাবনা, নানা চিন্তার উদয় হইতে লাগিল। একদিকে ক্ষুধা-তৃষ্ণার প্রবল জ্বালা, অপরদিকে শ্রান্ত-ক্লান্ত অবসন্ন দেহ। তাহার মন ও মানসকিতার উপর বিরাট প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিল। এমন সময় হঠাৎ তাহার ক্ষীণ দৃষ্টি প্রবাহমান জলস্রোতের উপর পতিত হইল। তিনি দেখিতে পাইলেন যে, নদীর স্রোতের উপর কূল ঘেঁষিয়া একটি পরিপক্ক লোহিতাভ আপেল ফল ভাটির টানে ভাসিয়া যাইতেছে। তিনি উক্ত ফলটি উঠাইয়া আনিলেন এবং পরম তৃপ্তি সহকারে উহা ভক্ষণ করিয়া আল্লাহপাকের শুকরিয়া আদায় করিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই তাহার হুশ হইল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, এই ভাসমান ফল ভক্ষণ করা কি ঠিক হইয়াছে? এই ফলের মালিক কে? কোথা হইতে এই ফল ভাসিয়া আসিয়াছে, ইহার কিছুইত তিনি জানেন না। তবে কি তিনি পর দ্রব্য ভক্ষণজনিত অপরাধ লইয়াই মহাবিচারক

আল্লাহর সামনে হাজির হইবেন? তাহার বিবেক নিদারুণ জ্বালায় পীড়িত হইয়া পড়িল। পরিশেষে তিনি স্থির সিদ্ধান্ত করিলেন যে, যেমন করিয়াই হউক, এই ফলের মালিককে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে, তাহার নিকট হইতে ক্ষমা চাহিয়া লইতে হইবে।

তিনি মনে মনে ভাবিলেন—নদীর উজানে তীর সংলগ্ন দিকে কোনও ফলের বাগান থাকিতে পারে। সেই বাগান হইতে বিচ্যুত আপেল ফলই হয়তো স্রোতের টানে ভাসিয়া যাইতেছিল। নদী কূল ঘেঁষিয়া উজানের দিকে সন্ধান করিলে ভাসমান আপেল ফলের মূল উৎসের খোঁজ পাওয়া যাইতে পারে। এই ভাবিয়া তিনি স্রোতের বিপরীত দিকে বিষণ্নচিত্তে হাঁটিতে লাগিলেন এবং মনে মনে আল্লাহ পাককে স্মরণ করিতে লাগিলেন। মাথার উপরে গ্রীষ্মের প্রখর সূর্য। চারিদিকে উত্তপ্ত বায়ু প্রবাহ। পরিশ্রান্ত দেহ আর সামনের দিকে অগ্রসর হইতে চাহিতেছে না। তথাপি তিনি অতি কষ্টে আস্তে আস্তে হাঁটিতে লাগিলেন। শত দুঃ-যাতনা ও কষ্ট তাহাকে প্রদমিত করিতে পারিল না। অবশেষে ক্রমাগত কয়েকদিন চলিবার পর সত্যিই তিনি নদীর তীরে একটি সুবৃহৎ ফলের বাগান দেখিতে পাইলেন। নানা রংয়ের অসংখ্য কাচা পাকা ফল বাগানের প্রতিটি বৃক্ষে শোভা পাইতেছে। নদীর পানির উপর ঝুকিয়া রহিয়াছে একটি সুবৃহৎ আপেল গাছ। সেই বৃক্ষে পরিপক্ক, অর্ধপক্ক ও কাচা-পাকা অনেক আপেল রহিয়াছে। মাঝে মাঝে সেই গাছ হইতে বৃন্তচ্যুত হইয়া দুই একটি সুবৃহৎ আপেল ফল নদীর পানিতে ঝরিয়া পড়িতেছে এবং প্রবল স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, এই বাগানচ্যুত ভাসমান ফলই তিনি ভক্ষণ করিয়াছেন। লোকজনের কাছে জিজ্ঞাসা করিয়া তিনি জানিতে পারিলেন যে, এই বাগানের মালিকের নাম সাইয়্যেদ আবদুল্লাহ সাউয়েমী (রহঃ)। তিনি একজন খোদাভীরু ধর্মপ্রাণ সাধক। আল্লাহপাকের মারেফাতের সাগরে সর্বদাই নিমজ্জিত থাকেন। সাইয়্যেদ আবু সালেহ মনে মনে ধারণা করিলেন—এই মহৎ প্রাণ পুণ্যশীল পুরুষের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলে ইহা অবশ্যই প্রত্যাখ্যাত হইবে না তাই তিনি আশায় বুক বাঁধিয়া সাইয়্যেদ আবদুল্লাহ সাউয়েমী (রহঃ)-এর বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। সৌম্য প্রশান্ত জ্যোতির্ময় চেহারবিশিষ্ট গৃহস্বামী তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইলে শ্রদ্ধায় ও ভক্তিতে তাহার মস্তক অবনত হইল। কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থাকিবার পর নিজের পরিচয় প্রকাশ করিলেন এবং ফল ভক্ষণজনিত যাবতীয় ঘটনা বিবৃত করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

গৃহস্বামী সাইয়্যেদ আবদুল্লাহ সাউমেয়ী (রহঃ) বহিরাগত ও অপরিচিত সাইয়্যেদ আবু সালেহ মূসা জঙ্গীর দিকে অনেকক্ষণ নিষ্পলক নেত্রে চাহিয়া রহিলেন। অবাক বিস্ময়ে তাহার বাকশক্তি তিরোহিত হইল। সামান্য ফল ভক্ষণজনিত অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনার জন্য একটি লোক এতদূর পর্যন্ত আসিতে পারে, ইহা তাহার কল্পনারও অতীত ছিল। তিনি মনে মনে চিন্তা করিলেন নিশ্চয়ই এই আগন্তুকের মধ্যে এমন একটি গুণ ও সত্তা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে যাহার দ্বারা বিশ্বের কল্যাণ সাধিত হইবে। আবার তাহার মনের মধ্যে একটি গোপন আকাংখাও মাথা চাড়া দিয়া উঠিল। প্রকাশ্যে উহা তিনি প্রকাশ না করিয়া বরং কিছুটা অসন্তোষ প্রকাশ করতঃ বলিলেন, 'হে আগন্তুক! পরের দ্রব্য যদি বিনষ্টও হইয়া যায় তথাপি উহাকে ভক্ষণ করিবার অধিকার তোমার নাই। আমার অনুমতি ছাড়া আমারই বাগানের ফল ভক্ষণ করিয়া তুমি অপরাধ করিয়াছ, উহা আমি কিছুতেই ক্ষমা করিতে পারি না।'

গৃহস্বামীর বাক্য শ্রবণ করিয়া আবু সালেহ মূসা জঙ্গীর মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি কি ভাবিয়াছিলেন, এখন কি ঘটিল? তিনি অত্যন্ত সবিনয়ে কাতরভাবে আরজ করিলেন—'মহাত্মন! বর্তমানে আমার নিকট সহায়-সম্পদ কিছু নাই যাহার দ্বারা উক্ত ফলের মূল্য আমি পরিশোধ করিতে পারি। আমি নিজে অপরাধ করিয়াছি এবং নিজেই উহার জন্য ক্ষমা

প্রার্থনা করিতেছি। আপনি ক্ষমা না করিলে, এই পাপ হইতে মুক্তি পাওয়ার কোন পথই আমি দেখিতেছি না।'

বাগান মালিক সাইয়্যেদ আবদুল্লাহ সাউমেয়ী (রহঃ) বলিলেন, হে আগন্তুক! এই পৃথিবীর এমনই ধারা যে, উহার অধিবাসীগণ তাহাদের প্রিয়তম বস্তুর মায়া ও দাবী পরিত্যাগ করিতে পারে না। সুতরাং আমারও অবস্থাও তাই। সুতরাং উহার দাবী পরিত্যাগ করা কিছুতেই আমার পক্ষে সম্ভব নহে।

বাগান মালিকের উত্তর শুনিয়া সাইয়্যেদ আবু সালেহ মূসা জঙ্গী (রহঃ) দুঃখে ও আতঙ্কে কাঁদিয়া বুক ভাসাইতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই বাগান মালিকের মন নরম হইল না। তিনি স্বীয় দাবীতে অবিচল রহিলেন। পরিশেষে আবু সালেহ অশ্রু বিজড়িত কণ্ঠে আরজ করিলেন—মহাত্মন! আমার ধৃষ্টতাজনিত অপরাধ কি প্রকারে আপনি ক্ষমা করিতে পারেন উহার যথার্থ পন্থা আমাকে বলিয়া দিন। অন্যথায় আমি কেমন করিয়া এই অপরাধের কালিমা মাখা দেহ লইয়া শেষ বিচারের কালে আল্লাহপাকের নিকট মুখ দেখাইব? আগন্তুকের এহেন কাতরোক্তি, রোনাজারি এবং বিনয়ে মুগ্ধ হইয়া বাগানের মালিক বলিলেন, হে আগন্তুক। এতটা বিচলিত হইও না। তুমি যদি প্রকৃত খোদাভীরু হও আর পরকালের আজাবকে ভয় কর তাহা হইলে আমি তোমাকে এক সুন্দর পরামর্শ দিতেছি, তুমি দীর্ঘ বার বৎসর আমার গৃহভৃত্য হিসাবে কাজ করিবে। তোমার কাজ ও নিষ্ঠা দেখিয়া বার বৎসর পরে আমি বিবেচনা করিয়া দেখিব তোমাকে ক্ষমা করা যায় কি না।

সাইয়্যেদ আবু সালেহ বাগান মালিকের প্রস্তাব বিনীতভাবে গ্রহণ করিলেন। বাগান মালিক আবু সালেহকে ভৃত্য হিসাবে নিয়োগ করিলেও ভৃত্যসুলভ শাসন ও কঠোরতা তাহার প্রতি কখনও প্রদর্শন করেন নাই। পক্ষান্তরে নিজের অগাধ জ্ঞান গরিমা, মারেফাতের গুপ্ততত্ত্ব, মহৎ ও কল্যাণময় মধুর সংস্পর্শে আবু সালেহের জীবনকে মহিমান্ডিত করিয়া তুলিলেন। সুযোগ্য শিক্ষকের একান্ত বাধ্যগত ও অনুরক্ত ছাত্র হিসাবে তিনি চরিত্র মাহাত্ম্য, শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞানানুশীলন ও খোদাপ্রেমের অতন্দ্র প্রহরী হিসাবে নিজেকে বিকশিত করিয়া তুলিলেন। এমনিভাবে বারটি বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেল। অতঃপর আবু সালেহ (রহঃ) বাগান মালিক ও উস্তাদ সাইয়্যেদ আবদুল্লাহ (রহঃ)-এর নিকট পূর্বকৃত আপেল ফল ভক্ষণজনিত অপরাধ ক্ষমা চাহিলেন। উত্তরে গৃহস্বামী বলিলেন—শোন বৎস! তোমার কাজ, কথা, আচার, সততা ও নিষ্ঠা অবলোকন করিয়া আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি। তবে আমার শেষ বক্তব্য হইল যে—আমার একজন বিবাহযোগ্য কন্যা আছে। সে অত্যন্ত কুৎসিত, বধির, খঞ্জ, বোবা এবং অন্ধ। তাহাকে আমি অন্য কোথাও পাত্রস্থ করিতে পারিতেছি না। কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা হিসাবে তাহার জন্য দুশ্চিন্তায় আমার সুনিদ্রা হয় না। তোমার কৃত অবৈধভাবে ফল ভক্ষণের অপরাধ আমি ক্ষমা করিতে পারি, যদি তুমি আমার কন্যাকে বিবাহ করিতে সম্মত হও। অন্যথায় আমি তোমাকে ক্ষমা করিব না।

সাইয়্যেদ আবু সালেহ (রহঃ) এই প্রস্তাব শুনিয়া অতিশয় বিচলিত হইয়া পড়িলেন। তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া গেলেন। পার্থিব জগতের কামনা-বাসনা, আশা-আকাঙ্খাকে বিসর্জন দিয়াও পরকালের মুক্তি ও সুখ-সম্ভোগকে তিনি অগ্রাধিকার দিতে মনস্থ করিলেন। পরিশেষে গৃহস্বামীর এই কঠিন প্রস্তাবও তিনি সানন্দে গ্রহণ করিলেন।

গৃহস্বামী অতিশয় খুশী হইয়া সাইয়্যেদ আবু সালেহ (রহঃ)-এর সঙ্গে স্বীয় কন্যা উম্মুল খায়ের ফাতেমা (রহঃ)-এর শুভ বিবাহ কাজ সম্পন্ন করিয়া দিলেন।

অতঃপর দিনান্তে মুক্ত আকাশে শুক্লা দ্বাদশীর চাঁদ হাসিয়া উঠিল। নিথর নিঝুম শান্ত রজনীর কোমল হাতছানিতে বিপুলা বসুন্ধরা তন্দ্রা জড়ানো চাদর চতুর্দিকে বিছাইয়া দিল। একটি মনোরম

প্রকোষ্ঠে নব দম্পতির জন্য বাসর ঘর সাজানো হইল। নির্দিষ্ট সময় বর সাইয়্যেদ আবু সালেহ (রহঃ) বাসর গৃহে প্রবেশ করিলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন, সুসজ্জিত পালঙ্কের উপর একজন সুন্দরী সুঠামদেহি, অপ্সরীসম রূপসী বসিয়া রহিয়াছেন। তাহার হাত, পা, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা সবই অত্যন্ত সুন্দর ও নিখুঁত। তাহার অতলান্ত নির্মল দৃষ্টি, শ্রবণেন্দ্রিয়ের তীক্ষ্ণতা এবং মৃদুভাষণের মনোহারিত্বে তিনি স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। সাইয়্যেদ আবু সালেহ (রহঃ)-এর মনে দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব দানা বাঁধিয়া উঠিল। তিনি মনে মনে ভাবিলেন, ইহাও কি সম্ভব? শ্বশুর কর্তৃক বর্ণিত গুণাবলীর সঙ্গে উপস্থিত রমণীর কোন দিকেই মিল হইতেছে না। যাহার সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছে সেই রমণী কি এই! তবে কি তাহার সহিত উপহাস অথবা পরীক্ষার অবতারণা হইতেছে। এই অসামান্যা রূপের অধিকারী রূপবীর গৃহে তিনি ভুলক্রমে প্রবেশ করেন নাই তো? ইহা কি হইল? না জানি আবার কোন নূতন বিপদ তাহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাই তিনি বাসর গৃহে অবস্থান করা শ্রেয় মনে করিলেন না। ধীর পদক্ষেপে চিন্তাক্লিষ্টভাবে উক্তগৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার জন্য দরজার দিকে পা বাড়াইলেন। এমন সময় তাহার শ্বশুর সাইয়্যেদ আবদুল্লাহ সাউমেয়ী (রহঃ) গৃহদ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং তাহার হস্ত ধারণ করতঃ বাসর গৃহে প্রবেশ করিলেন। স্মিত হাস্যে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন, 'প্রিয় বৎস, আমি অনুভব করিতেছি যে, তুমি অনেকটা হতচকিত ও বিস্ময়াপন্ন হইয়া পড়িয়াছ। তবে তোমার সন্দেহের কোন কারণ নাই। তোমার সম্মুখে যে মেয়েটি উপবিষ্ট রহিয়াছে, সে-ই আমার কন্যা সাইয়্যেদা ফাতেমা—তোমার বিবাহিতা স্ত্রী'।

আবু সালেহ (রহঃ) আরজ করিলেন—আপনি বলিয়াছিলেন আপনার কন্যা কুৎসিত, বোবা, বধির ও অন্ধ।"

সাইয়্যেদ আবদুল্লাহ সহাস্যে বলিলেন—'প্রিয় বৎস! আমি তোমাকে পরীক্ষা করিবার জন্য এরূপ বলিয়াছিলাম এবং আমার বলার পিছনে কারণও রহিয়াছে। তাহা এই যে—আমার আদরের কন্যা তাহার চক্ষুযুগল দ্বারা কোন পর-পুরুষকে অদ্যাবধি অবলোকন করে নাই, এমনকি আমার বাসস্থানের বাহিরে কোন বস্তু দর্শন করে নাই। সেই হেতু তাহাকে আমি অন্ধরূপে আখ্যায়িত করিয়াছিলাম। জন্মান্ধ নহে বরং বহির্জগতের বেশরা দৃষ্টিপাত হইতে মুক্ত ও অন্ধ। তাহাকে এইজন্য বোবা বলিয়াছিলাম যে, একমাত্র পিতা-মাতা ছাড়া তাহার কণ্ঠস্বর কোনও পরপুরুষ অদ্যাবধি শ্রবণ করে নাই। আর তাহাকে খঞ্জ বলার কারণ এই যে, এই বয়স পর্যন্ত সে পদভরে হাটিয়া বেপর্দায় বহির্বাটিতে গমন করে নাই এবং পরপুরুষের কোন মজলিসেও গমন করে নাই। আর তাহাকে বধির বলার অর্থ এই যে, সে কেবলমাত্র পিতা-মাতা ছাড়া অদ্যাবধি অন্য কাহারও কণ্ঠস্বর শ্রবণ করে নাই। আর যেহেতু আমার কন্যাকে কেহই দেখিতে পায় নাই এইজন্য সকলের নিকট তাহাকে কুৎসিত বলিয়াই তুলিয়া ধরিয়াছি। হে বৎস! আমার কন্যার রূপ যেভাবে আমি তোমার নিকট বর্ণনা করিয়াছি, তাহা অলীক ও মিথ্যা নহে। কেননা সাধারণতঃ সমাজে মেয়েদের সম্পর্কে যে গুণ ও অবস্থার কথা প্রচলিত হইয়া পড়ে আমার কন্যার বেলায় এইরূপ ঘটিতে দেওয়া হয় নাই। তাই এই ক্ষেত্রে সমস্ত কথা তোমাকে খোলাখুলি না বলিয়া পরোক্ষভাবে বলার উদ্দেশ্য হইল এই যে, তুমি যেদিন সামান্য আপেল ভক্ষণের অপরাধ মার্জনার জন্য সীমাহীন কষ্ট উপেক্ষা করিয়া আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলে, সেইদিন তোমার কপালে একটি নূরের ঝলক দেখিয়া বুঝিয়াছিলাম যে, পরম করুণাময় আল্লাহতায়ালা তোমাতে এমন একটি গোপনীয় পরমধন লুক্কায়িত রাখিয়াছেন, যাহা পৃথিবীবাসীর জন্য হেদায়েতের মশালরূপে পরিচিত্রিত হইবে এবং আমি মনে মনে ধারণা করিয়াছিলাম যে, তোমার মত পূতঃচরিত্র ও প্রভুভক্ত ব্যক্তিই হইবে আমার কন্যার যোগ্য পাত্র।

বলিতে কি, তোমার নিকট আমার এই বিদূষী কন্যাকে সমর্পণ করিতে পারিয়া এবং তোমার বুদ্ধিমত্তা, সততা ও নিষ্ঠায় মুগ্ধ হইয়া আল্লাহ পাকের হাজারো শুকরিয়া আদায় করিতেছি। আর তুমি জানিয়া রাখ যে, আমার কন্যাকেও আমি শরীয়ত ও মারেফাত বিদ্যায় পারদর্শিনী করিয়া তুলিয়াছি। বর্তমান যুগের নারী সমাজের প্রতি যদি অবলোকন কর, তাহা হইলে তাহাদের তুলনায় আমার কন্যাকে দুর্লভ বলিয়া মনে হইবে।

সাইয়্যেদ আবু সালেহ (রহঃ) স্বীয় গৃহস্বামী ও শ্বশুরের নিকট হইতে সকল রহস্যাবলী জানিতে পারিয়া পরম আনন্দিত হইলেন এবং পরম কৌশলী আল্লাহ পাকের দরবারে হাজারো শুকরিয়া আদায় করিলেন।

পরিশেষে সাইয়্যেদ আবদুল্লাহ (রহঃ) স্বীয় কন্যা ও জামাতাকে উভয় পার্শ্বে বসাইলেন এবং তাহাদের মঙ্গলের জন্য পরম করুণাময় আল্লাহ বেনিয়াজের দরবারে হাত উঠাইয়া আরজ করিলেন—"হে সর্বমঙ্গলের নিয়ন্ত্রণকর্তা! আজ তোমার নির্দেশে যাহারা পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইল, তাহাদের দাম্পত্য জীবন ও সংসার জীবন তুমি আনন্দময়, সার্থক ও মঙ্গলময় করিয়া তোল। আর তাহাদিগকে এমন নেক সন্তান দান কর, যাহার গুণ-গৌরবে পবিত্র ইসলামের মর্যাদা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে এবং ইসলাম ধর্মে নব-প্রাণের সঞ্চার ঘটিবে।"

সাধক প্রবরের এই প্রার্থনা দয়াময় আল্লাহতায়ালা কবুল করিয়াছিলেন। পরবর্তী কালে এই পুণ্যবান পিতা ও পূণ্যশীলা মাতার গৃহেই আউলিয়াকুল শ্রেষ্ঠ, তাপসকুল শিরমণি, মাহবুবে সোবহানী সাইয়্যেদ বড়পীর আবদুল কাদের জিলানী (রহঃ) জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

শুভ জন্ম

হিজরী পঞ্চম শতাব্দীর শেষ প্রান্তে মুতাবিক চারিশত একাত্তর হিজরী সালের মাহে শাবানের সমাপ্তিতে রমজান মাসের পহেলা তারিখ ছোবহে ছাদেকের শুভলগ্নে মাহবুবে ছোবহানী কুতবে রাব্বানী তাপষকুলের মধ্যমনি গাউছুল আজম হযরত আবদুল কাদের জীলানী (রহঃ) পারস্যের জিলান বা গিলান নগরীর সাইয়্যেদ পরিবারে পিতা সাইয়্যেদ আবু ছালেহ মূসা জঙ্গী (রহঃ) ও মাতা সাইয়্যেদাহ উম্মুল খায়ের ফাতেমা (রহঃ)-এর গৃহে জন্মগ্রহণ করিলেন। জিলান নগরে জন্মগ্রহণ করার কারণেই তাহার নামের সহিত জিলানী শব্দটিও সংযোজিত হইয়াছে। শিশু পুত্রের পবিত্র মুখাবয়ব এবং উজ্জ্বল কান্তি দর্শন করিয়া পিতা-মাতার মন খুশীতে ভরিয়া গেল। প্রতিবেশী ও আত্মীয় স্বজনগণ নবজাতকের আনন্দ সুন্দর মুখমন্ডল এবং নধর কান্তি অবলোকন করিয়া বিস্ময়াবিভূত হইল।

শিশুর পিতা এক অদৃশ্য দৈববাণীর নির্দেশ অনুযায়ী পুত্রের নাম রাখিলেন আবদুল কাদির (রহঃ)। উল্লেখ্য যে শিশু আবদুল কাদির (রহঃ) জন্মের সঙ্গে সঙ্গে পিতা-মাতার গৃহে ও তদেলাকার বিভিন্ন স্থানে নানা রূপ শুভলক্ষণ প্রতিভাত হইতে লাগিল। লোকগণ বিভিন্ন অলৌকিক কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ করিল। বলাবাহুল্য যে, শিশুর পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনদের অনেকেই বুঝিতে পারিলেন যে, ইহা তাহাদের এই শিশু জন্মেরই বরকতময় ফল।

বাল্যকাল এবং শিক্ষা

হযরত বড়পীরের বাল্যকাল বড়ই সুখময় এবং আনন্দপূর্ণ ছিল। পিতামাতা উভয়ই তাহাকে মনেপ্রাণে ভালবাসিতেন এবং স্নেহ ও আদরে সিক্ত করিয়া রাখিতেন। তাহার মধ্যে কতগুলি অপূর্ব বাল্যবৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হইতেছিল। অন্যান্য বালকদের মত তাহার মধ্যে বালকসুলভ চপলতা বা খেলাধূলার প্রতি মোটেই আকর্ষণ ছিল না। পরবর্তী জীবনে তিনি নিজেই বলিয়াছেন,

বাল্যকালে সমবয়সী সঙ্গীদের সহিত মিশিবার আকাঙ্খা আমার মনে যখনই উদয় হইত তখনই আমার কানে এক আদৃশ্য আওয়াজ ভাসিয়া আসিত, "ইলাইয়্যা ইয়া মুবারাক" অর্থাৎ হে ভাগ্যবান শিশু! তুমি আমার দিকে চলিয়া আস। এইরূপ আওয়াজ শুনিয়া যদিও আওয়াজ দাতাকে আমি চোখের সামনে দেখিতে পাইতাম না, কিন্তু আমি উহার প্রভাবে সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িতাম এবং দৌড়াইয়া গিয়া মাতার ক্রোড়ে মুখ গুজিতাম, ছেলেপেলেদের সাথে মিশিতে আর সাহস হইত না। আমি ঐরূপ অদৃশ্য আওয়াজ শুনিবার কথা মাতার নিকট খুলিয়া বলিতাম, তিনি শুনিয়া অনেক রকম প্রবোধ দিতেন, আশ্বস্ত করিতেন, আমি লক্ষ্য করিতাম, আমার মাতার মুখ মন্ডল তখন আনন্দোজ্জ্বল হইয়া উঠিত।

হযরত বড় পীর (রহঃ)-এর বাল্যশিক্ষার সূচনা হইয়াছিল স্বীয় জনক-জননীর কাছে। তিনি তাহার প্রাথমিক স্তরের শিক্ষণীয় বিষয়গুলি তাহাদের নিকট গৃহে বসিয়াই সমাপ্ত করিয়াছিলেন। সর্ব প্রথমেই তিনি পবিত্র কুরআন পাঠ শিক্ষা করত পূর্ণ কুরআন শরীফ হেফজ করেন। তিনি আল্লাহ প্রদত্ত প্রখর ধীশক্তি এবং অপূর্ব প্রতুৎপন্ন মতিত্বের ফলে বাল্যেই অসাধারণ জ্ঞান ও পান্ডিত্যের অধিকারী হন।

পিতার মৃত্যু

হযরত বড় পীর (রহঃ)-এর পিতা স্বীয় পুত্রের তীক্ষ্ণ মেধাশক্তি, শিক্ষার প্রতি অত্যধিক আগ্রহ এবং উচ্চশিক্ষা লাভের প্রবল আকাঙ্খা বিশেষ ভাবেই লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিলেন। তাই গৃহ শিক্ষা ও স্থানীয় মক্তব শিক্ষা সমাপ্তির পর তাঁহার জন্য উচ্চ শিক্ষা লাভের বন্দোবস্ত করিতে তিনি বদ্ধপরিকর ছিলেন। কিন্তু জিলানে বা তাহার নিকটে এরূপ কোন শিক্ষায়তন না থাকায় পুত্রের অল্প বয়স এবং তৎকালীন পারিপার্শ্বিক অবস্থা চিন্তা করিয়া তিনি সময় ও সুযোগের অপেক্ষা করিলেন। কিন্তু আল্লাহ মানুষের অনেক আশাই যে কোন কারণে হউক সফল করেন না। এক্ষেত্রেও তদ্রূপ হইল। হযরত বড় পীর (রহঃ)-এর পিতা মনের আশা মনে রাখিয়াই পরম স্নেহের বালক পুত্র ও স্ত্রীকে অনন্ত শোক সাগরে ভাষাইয়া ইহলোক ত্যাগ করিলেন।

যে সময়ের কথা বলিতেছি সে সময়ে ইরাকের বাগদাদ নগরী ছিল সারা মুসলিম জাহানের শিক্ষা ও সভ্যতার শ্রেষ্ঠ পীঠস্থান। সেখানে তখন মুসলমানদের উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য অনেকগুলি উচ্চ পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল। তন্মধ্যে নিজামিয়া মাদ্রাসা ছিল সকলের উপরে। মুসলিম জাহানের বিভিন্ন এলাকা হইতে বহু শিক্ষার্থী এখানে আসিয়া বিভিন্ন শাস্ত্রে উচ্চ শিক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং সভ্যতা অর্জন করতঃ নিজেদের জীবন ধন্য ও সার্থক করিত। পারষ্যের জিলান নগরী হইতে বাগদাদ নগরীর দূরত্ব প্রায় চারিশত মাইল।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, বড়পীর হযরত বালক আবদুল কাদির (রহঃ)-এর উচ্চশিক্ষা লাভের আকাঙ্ক্ষা ছিল প্রবল।

বিভিন্ন শাস্ত্রে উচ্চশিক্ষা লাভ

বড়পীর হযরত আবদুল কাদের (রহঃ) বাগদাদ নগরীর কথা নানা জনের নিকট শুনিলেন এবং উচ্চশিক্ষা লাভের উদগ্র বাসনা তাহাকে ক্রমেই অস্থির করিয়া তুলিতে লাগিল। তিনি তাঁহার মাতার নিকট নিজ মনোবাসনার কথা উল্লেখ করিলেন। তাহার মাতাও পরম বুদ্ধিমতি ও জ্ঞানবতী মহিলা ছিলেন। পুত্রকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তোলা তাঁহারও আগ্রহ ছিল। কিন্তু তিনি তখন আটাত্তর বৎসর বয়স্কা বৃদ্ধা মহিলা ছিলেন এবং পরিবারে তাহার ঐ এক পুত্ররত্ন ছাড়া অন্য কেহই ছিল না। তবু তিনি নিজের বিষয় কোন কিছু চিন্তা না করিয়া পুত্রকে উচ্চ শিক্ষাদানের জন্য সুদূর বাগদাদ প্রেরণ করার মনস্থ করিলেন। পক্ষান্তরে পুত্র হযরত আবদুল কাদের (রহঃ)

যদিও উচ্চ শিক্ষালাভের জন্য ব্যাগ্র ছিলেন, সাথে সাথে তাঁহার বৃদ্ধা মাতার দেখাশুনার ভার তাহার অনুপস্থিতে কে বহন করিবে এ কথাও যে তাঁহার মনকে ভাবাইয়া তুলিতেছিল না তাহা নহে। তাই তিনি মাতাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, হে আম্মাজান! আমি বিদেশে চলিয়া গেলে কে আপনাকে দেখাশুনা করিবে? পুত্রের এ প্রশ্নের উত্তরে দৃঢ়মনোবলের অধিকারিণী ও পরম ধৈর্য্যশালিনী মাতা বলিলেন, বৎস! তুমি সেই চিন্তা করিও না। পরম করুণাময় আল্লাহতায়ালা সর্বস্থানে সর্বক্ষণই বিরাজমান। তিনিই সকলকে দেখাশুনার ভার বহন করেন। মাতা আরও বলিলেন, পুত্র! তুমি নিশ্চিন্তে বাগদাদ গিয়া উচ্চশক্ষা লাভ করতঃ তোমার পরলোকগত পিতার আকাঙ্খা পূর্ণ করিবে। আমি একান্ত ভাবেই এই আশা পোষণ করি। আর আমি মনেপ্রাণে আশীর্বাদ করিতেছি যেন আল্লাহতায়ালা তোমার ও তোমার পরলোকগত পিতার আশা পূর্ণ করেন। মাতার মুখের এই শান্ত স্নিগ্ধ অথচ দৃঢ়তাব্যঞ্জক বাক্য শুনিয়া মুগ্ধ পুত্র আর কোন কথা বলিলেন না, শুধু এই বাক্যটি উচ্চারণ করিলেন, মাতাঃ আল্লাহর দরবারে আপনার এ আশা সফল হউক।

ইহার পর কিছু দিনের মধ্যেই একটি বাগদাদগামী ব্যবসায়ী কাফেলা প্রস্তুত হইল। হযরত বড়পীর (রহঃ) তাহাদের সাথে বাগদাদ রওয়ানা করার জন্য তৈরী হইলেন এবং মাতার নিকট হইতে আন্তরিক দোয়া গ্রহণ করতঃ মাতৃভূমি ত্যাগ করতঃ উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য বাগদাদ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাহার মাতা পুত্রকে প্রবাস জীবনে ও সফরকালে যে কোন অবস্থায় সত্য ও সততা রক্ষা করার উপদেশ দিয়া তাহাকে মহান প্রভু আল্লাহর হাতে সোপর্দ করিয়া দিলেন। পথে উক্ত ব্যবসায়ী কাফেলা একদল দুর্ধর্ষ ডাকাত কর্তৃক আক্রান্ত হইল এবং তাহাদের যথা সর্বস্ব লুণ্ঠিত হইল। কিন্তু দস্যুদল হযরত বড় পীরের অপূর্ব আচরণ এবং সত্য ও সততায় মুগ্ধ হইয়া লজ্জিত এবং অনুতপ্ত হইল এবং তাহাদের সারা জীবনের অভ্যাস দস্যু বৃত্তি জীবনের তরে পরিত্যাগ করিল।

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, তৎকালে বাগদাদের নিজামিয়া মাদ্রাসা ছিল তথাকার সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষায়তন। হযরত বড় পীর (রহঃ) বাগদাদ পৌছিয়া উক্ত শিক্ষায়তনেই ভর্তি হইয়া গেলেন। উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণও প্রত্যেকে ছিলেন সমসাময়িক যুগের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞ এবং যোগ্য আলেম। তাহাদের সংস্পর্শে ও যত্নে শিক্ষার্থীদের ইলমে শরীয়ত এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য শাস্ত্রের সাথে সাথে আধ্যাত্মিক শাস্ত্রেরও শিক্ষা লাভ হইত। হযরত বড়পীর সাহেব (রহঃ) এই সুযোগ্য শিক্ষক মন্ডলীর কাছে বিভিন্ন বিষয়ে তথা তেরটি শাস্ত্রে গভীর জ্ঞান এবং ব্যুৎপত্তি লাভ করিলেন। বিশেষতঃ জন্মগতভাবেই তিনি ছিলেন প্রখর মেধা বা ধীশক্তির অধিকারী। কাজেই অপেক্ষাকৃত অনায়াসে এবং অল্প সময়েই তিনি বিভিন্ন শাস্ত্র পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিলেন, যাহার ফলে শিক্ষক মন্ডলীর প্রত্যেকেরই আন্তরিক স্নেহ এবং দৃষ্টি আকর্ষণে তিনি সফল হইয়াছিলেন।

হযরত বড়পীর (রহঃ) যে সকল শাস্ত্রে পরিপক্ক জ্ঞান অর্জন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি সমধিক উল্লেখযোগ্য। যেমন ঃ (১) হাদীস শাস্ত্র (২) তাফসীর শাস্ত্র (৩) আদব (৪) সাহিত্য (৫) দর্শন ও (৬) ব্যাকরণ।

নিজামিয়া মাদ্রাসার অন্যতম অধ্যাপক কাজী আবু সাঈদ মুবারক (রহঃ) শিষ্য বড়পীর হযরত আবদুল কাদের (রহঃ)-কে অত্যধিক ভাল বাসিতেন এবং আদ-যত্ন করিতেন। তিনি তাঁহার এই শিষ্যের মধ্যে লুক্কায়িত গুণ এবং প্রতিভার পরিচয় পাইয়া অনেক সময়ই তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেন, হে আব্দুল কাদের! শীঘ্রই দুনিয়ার মানুষ তোমার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িবে

এবং তোমার গুণ ও জ্ঞানের মাধ্যমে তাহারা দুনিয়া ও আখেরাতের অশেষ উপকার লাভ করিবে।

হযরত বড়পীর (রহঃ) হাদীস শাস্ত্রে অগাধ পামন্ডিত্য অর্জন করিয়াছিলেন। এই শাস্ত্রে সর্বোচ্চ খেতাব প্রদান অনুষ্ঠান কালে মাদ্রাসার অধ্যাপকগণ সম্ভাব্য মন্তব্য করিয়াছিলেন, হে আবদুল কাদির! হাদীস শাস্ত্রের সনদ দানের এই প্রচলিত আনুষ্ঠানিক বহু দিন হইতেই চলিয়া আসিতেছে। তবে এ কথা সত্য যে, হাদিস শাস্ত্রের মর্মোদঘাটন এবং তত্বলাভে আমরা তোমার নিকট হইতে বহু সাহায্য ও উপকার লাভ করিয়াছি।

নিজামিয়া মাদ্রাসার সুবিজ্ঞ অধ্যাপকদের মুখে তাঁহাদেরই একজন শিষ্য সম্পর্কে এইরূপ মন্তব্য উক্ত শিষ্যের জ্ঞান বত্তা ও যোগ্যতার যে প্রমাণ বহণ করে, এ ব্যাপারে এতদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রমাণ আর কিছুই হইতে পারে না।

নিজামিয়া মাদ্রাসায় জাহেরী ইলম শিক্ষাগ্রহণ কালেই বড়পীর (রহঃ) ইলমে মারেফাত হাছিলের লক্ষ্যে তৎকালীন বাগদাদের বিভিন্ন শীর্ষস্থানীয় সুফী সাধকদের দরবারে যাতায়াত শুরু করেন এবং তাঁহাদের আধ্যাত্মিক ফায়েজের বরকতে ইলমে বাতেনেও তিনি পূর্ণ জ্ঞান লাভ করেন।

নিরলস সাধনা

জাহেরী ও বাতেনী ইলমে উচ্চ শিক্ষা লাভ করিবার পর বড়পীর হযরত আবদুল কাদের (রহঃ) স্বীয় জীবনের কঠোর সাধনা শুরু করেন। মূলতঃ যদিও তাঁহার সারা জীবনটিই ছিল কঠোর সংগ্রাম এবং সাধনার ক্ষেত্র, এ সময়কার সাধনা ছিল অভাবনীয়, অপূর্ব এবং অত্যাশ্চর্য যেহেতু বিভিন্ন বিষয়ে সুগভীর এবং অফুরন্ত জ্ঞানার্জনের সাথে সাথে তাঁহার স্রষ্টার প্রতি আকর্ষণ এবং প্রেমের গভীরতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাই সেই প্রভুর পূর্ণ পরিচয় এবং নৈকট্য লাভের ব্যাকুলতা তাঁহাকে অধীর করিয়া তুলে। এসময় তাঁহার মধ্যে পার্থিব বিষয় বিরাগ এবং আত্মবিস্মৃতির অবস্থা সৃষ্টি হয়। তিনি এ সময় জনকোলাহল পরিত্যাগ করতঃ জনবসতি হইতে বহু দূরে গমন করেন। শুরু হয় তাহার পাহাড়ে-প্রান্তরে, বনে-জঙ্গলে ভ্রমণ ও কাল যাপন। এ অবস্থায় তাহার বহুদিন কাটে। তাহার এ কৃচ্ছ সাধনাজীবনে তাহাকে একাধারে বহু দিন ধরিয়া উপবাসে অনাহারে কাটাইতে হইয়াছে। যখন আর ক্ষুধা-পিপাসার প্রকোপে প্রাণ রক্ষা পাইবে না বলিয়া আশঙ্কা দেখা দিত, তখন হয়ত কোন বৃক্ষপত্র চিবাইয়া তার সামান্য রস দ্বারা ক্ষুধা ও পিপাসা দূর করিতেন। এই নির্জন বাস জীবনে তিনি একেক সময় প্রভু স্রষ্টার ধ্যানে বসিয়া দীর্ঘ সময় তন্ময় হইয়া থাকিতেন। এভাবে ক্রমশঃ তাহার জীবনে জগতের সমগ্র সুফী সাধক এবং অলী কুলের শ্রেষ্ঠ আমল লাভের ক্ষেত্র তৈরী হইয়া চলিতেছিল।

মুর্শিদে কামিলের দীক্ষা

হযরত বড় পীর (রহঃ) এই সত্য পুরাপুরি ভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, আধ্যাত্মিক সাধনার পথ সুগম করিবার জন্য এবং তত্ত্বজ্ঞানের মর্ম উপলব্ধি করার লক্ষ্যে মুর্শিদে কামিলের দীক্ষা এবং সাহায্য প্রত্যেক সাধকের জন্য অপরিহার্য্য। এই কারণেই নিজেও তিনি তৎকালীন তরীকতের শ্রেষ্ঠ বুযুর্গ মহাসাধক শায়খ আবু সাঈদ মাখজুমী (রহঃ)-এর হাতে ইলমে মারেফাত তথা বাতেনী ইলমের দীক্ষা নিলেন। সুদক্ষ মুর্শিদের ফায়েজ এবং সাহচার্যের ফলে অচিরেই হযরত বড়পীর (রহঃ) কামালিয়াতের শীর্ষস্থানে আরোহন করিয়া পরিপূর্ণ রূপে কামিয়াবী হাসিল করিলেন। দীর্ঘদিন পর্যন্ত তিনি পীরের দরবারে অবস্থান করিয়া তাহার নিকট হইতে পূর্ণ ফয়েজ ও বরকত লাভ করিবার পর তাঁহারই অনুমতিক্রমে তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

এখানে উল্লেখ্য যে, হযরত বড়পীর (রহঃ) ইলমে মারেফাতের দীক্ষা যদিও হযরত আবু সাঈদ মাখজুমী (রহঃ)-এর হাতে লইয়া ছিলেন। কিন্তু তিনি ছাড়াও আরও বহু শ্রেষ্ঠ বুযুর্গ ও অলীদের সংস্পর্শেও তিনি আসিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের প্রত্যেকের নিকট হইতেই তিনি ফায়েজ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

কর্মজীবন

সাধনার সর্বোচ্চ সোপানে আরোহন করিবার পর তিনি দায়িত্ব এবং কর্তব্য পালনের তাকীদের কর্মজীবনের ডাকে সাড়া দিতে বাধ্য হইলেন এবং অচিরেই কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। ইসলামের প্রকৃত এবং সুষ্ঠু সেবা, বিশেষতঃ আখেরী নবী (সাঃ) প্রবর্তিত মুসলিম জীবন ব্যবস্থাকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার লক্ষ্যে তিনি গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করিলেন। তৎকালীন নিজামিয়া মাদ্রাসার সুযোগ্য অধ্যাপক বাগদাদের খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ হযরত আবু সাঈদ মুবারক (রহঃ) নিজের শিষ্য হযরত আবদুল কাদেরকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। বিশেষতঃ তাঁহার তীক্ষ্ণ মেধা ও জ্ঞানবুদ্ধির কারণে তাহার প্রতি অত্যন্ত সু ধারণা পোষণ করিতেন। তিনি এক সময়ে নিজামিয়া মাদ্রাসা হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া নিজে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাতে অধ্যাপনা শুরু করিয়াছিলেন। এক সময়ে তাঁহার সুযোগ্য শিষ্য বড়পীর হযরত আদুল কাদের (রহঃ)-কে নিজের সেই মাদ্রাসার পরিচালনা ও অধ্যাপনার দায়িত্ব সোপর্দ করিলেন। ইহাতে হযরত বড়পীর (রহঃ) স্বীয় জ্ঞান-গরিমা ও বুদ্ধি বিকাশের সুবর্ণ সুযোগ লাভ করিলেন। মুসলমানদেরকে.শিক্ষার মাধ্যমে প্রকৃত মুসলমানরূপে গঠন করার সংগ্রামী সাধনায় আত্মনিয়োগ করিলেন। তিনি স্বীয় বুদ্ধিমত্তা এবং প্রজ্ঞার সাহায্যে নব প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসার পরিচালনা ও শিক্ষাদান কার্য সুচারুরূপে চালাইয়া যাইতে লাগিলেন। তাঁহার অতুলনীয় ও অগাধ পাণ্ডিত্যে এবং অপরিসীম জ্ঞান ও প্রজ্ঞার প্রভাবে শিক্ষার্থীগণ সবিশেষ উপকৃত হইতে লাগিল। শিক্ষার্থীগণ অনেকদিন পর তাহাদের আকাঙ্খিত জ্ঞান সমুদ্রের সন্ধান লাভ করিয়া মধু মক্ষিকার ন্যায় তাহার চতুর্দিকে ঘিরিয়া রহিল। শুধু তাই নয়, বাহির হইতে অসংখ্য নূতন শিক্ষার্থী আসিয়া ঐ মাদ্রাসায় দাখিল হইল। এবার সীমিত আয়তনের মাদ্রাসা গৃহে এত অধিক সংখ্যক ছাত্র সঙ্কুলান হইল না। বাধ্য হইয়া বৃহৎ আয়তনের মাদ্রাসা গৃহ নির্মাণ করিতে হইল।

হযরত বড়পীর সাহেব যে বিষয়গুলিতে নিজে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, সেই বিষয়গুলিই শিক্ষার্থীদিগকে শিক্ষাদান করিতেন। বিষয়গুলি দুইভাবে বিভক্ত করিয়া তিনি দিনের প্রথম ভাগে ভোর হইতে বেলা দ্বিপ্রহর পর্যন্ত হাদীস শাস্ত্র, ন্যায় বিদ্যা, ব্যকরণ, ধর্মতত্ত্ব, উছুল এবং সাহিত্য শিক্ষা দিতেন। আর দিনের শেষভাগে অর্থাৎ দ্বিপ্রহরের পর হইতে এশার নামায পর্যন্ত পবিত্র কুরআনের অনুবাদ, তাফসীর তাওহীদ এবং ইসলামী আইন বিধি অর্থাৎ ইলমে ফিকাহ প্রভৃতি শিক্ষাদান করিতেন।

ইতিমধ্যে একদিন হযরত বড়পীর (রহঃ) স্বপ্নযোগে মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে ওয়াজ-নসীহত করার আদেশ প্রাপ্ত হইলেন এবং তদবধি তিনি প্রত্যেক ওয়াক্ত নামাযের বাদে কিছুক্ষণ পর্যন্ত ওয়াজ নসীহত করা শুরু করিলেন, জনসাধারণ তাঁহার সে অমূল্য নসীহত বাণী শুনিয়া একাধারে মুগ্ধ, তন্ময় এবং তৃপ্ত হইতে লাগিল। ক্রমান্বয়ে তিনি একটি সময় নির্দিষ্ট করিয়া জন সাধারণের মধ্যে ওয়াজ করিতে লাগিলেন। ওয়াজ মাহফিলের জন্য একটি সুপ্রশস্থ স্থানেও ব্যবস্থা করা হইল। ক্রমে ওয়াজের মাহফিলে লোকসমাগম এত বৃদ্ধি পাইল যে, তাহার জন্য শহরতলীর একটি বড় ঈদের ময়দান নির্দ্ধারণ করা হইল। আর উহার মধ্যস্থলে উঁচু মঞ্চ স্থাপন করা হইল। আল্লাহতায়ালা হযরত বড়পীর (রহঃ)-কে একজন যোগ্য বিচক্ষণ এবং শ্রেষ্ঠ বক্তার

সমস্ত গুণই দান করিয়াছিলেন। তাহার বক্তৃতার বিষয়বস্তু, ভাষা, কণ্ঠস্বরের উচ্চতা লালিত্য মাধুর্য্য, বর্ণনায় ক্ষুরধার যুক্তি তেজোপূর্ণ বর্ণনাভঙ্গী এবং বক্তৃতার যাদুকরী আকর্ষণ শক্তি মাহফিলের সমবেত শ্রোতৃমন্ডলীকে মুগ্ধ করিয়া ফেলিত। তাঁহার এই ওয়াজ মাহফিলে দেশের স্বয়ং খলীফা, উজীর, আমীর-উমারা, আলেম-ফাজেল, জ্ঞানী-গুণী, সুফী-সাধক, মুর্খ জাহেল এমনকি বিধর্মী কাফির-মুশরিক, ইহুদী, নাছারা পর্যন্ত তাঁহার বক্তৃতা শুনার জন্য মাহফিলে যোগদান করিত। কেহ কেহ বলেন যে, শুধু মানুষই নহে, অশরীরী জীবগণ পর্যন্ত উক্ত মাহফিলে ওয়াজ শুনিতে আসিত।

সাধারণ নিয়মানুযায়ী কামিল মুর্শিদগণ মোরাকাবাহ মোসাহাদা এবং ধ্যান তপস্যার মধ্যেই থাকিতে ভালবাসেন। নির্জনতাই তাহাদের অধিক কাম্য। বড়পীর হযরত আবদুল কাদের জীলানী (রহঃ) ও খাছ সময়ে মোরাকাবাহ মোসাহাদাহ করিতেন। নিরিবিলি পরিবেশে মুরীদ ও শিষ্যবর্গকে ইলমে তাছাওফের ছবক বাতাইতেন। কিন্তু তাহা সত্বেও হুজুরে পাক (সঃ)-এর স্বপ্নযোগে নির্দেশের তাগিদে এভাবে প্রকাশ্য সভায় দীর্ঘ সময় ধরিয়া ওয়াজ করিতে হইত। ইহার ফলে তাঁহার দ্বারা বহু নামধারী মুসলমান খাঁটি মুসলমানে পরিণত হইত এবং অসংখ্য বিধর্মী ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিত। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, হযরত বড়পীর (রহঃ) সাহেবের এই ধরনের কর্মপ্রণালী ও স্বীয় বৈশিষ্ট্যই তাহাকে অন্যান্য বুযুর্গ এবং সুফী সাধক হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। তাঁহার ঐরূপ সর্বমুখী প্রতিভা এবং কার্যধারাই তাঁহাকে দুনিয়ার সমস্ত অলীআল্লাহদের শীর্ষে আসন দিয়াছে।

স্বভাব চরিত্র

হযরত বড়পীর (রহঃ)-এর স্বভাব চরিত্র এক কথায় অনুপম এবং অতুলনীয় ছিল। এক দিকে যেমন তিনি দীর্ঘকাল কঠোর সাধনা বলে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ সাহচর্য, হিংসা, নিষ্ঠুরতা, পরিশ্রীকাতরতা, রিয়া, মিথ্যা, প্রবঞ্চনা প্রভৃতি শয়তানি স্বভাব সম্পূর্ণরূপে দমন করিয়াছিলেন। অন্য দিকে তেমনি বিনয়, নম্রতা, দয়া-দাক্ষিণ্য, স্নেহ-মমতা সহৃদয়তা, সদালাপ ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, পরোপকারিতা, পরদুঃখকাতরতা প্রভৃতি সদগুণাবলী দ্বারা স্বীয় চরিত্রকে বিভূষিত করিয়াছিলেন।

আচার ব্যবহার

তিনি উপরোক্ত অনুপম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন বলিয়া তাহার আচার ব্যবহার ছিল অত্যন্ত মধুর এবং আকর্ষণীয়। মানুষ তাঁহার আচার ও ব্যবহারে যেমনই মুগ্ধ হইত, তেমনই তাহার বশ হইয়া যাইত। তিনি মানুষকে যোগ্য সম্মান দান করিতেন। ছোটদেরকে স্নেহ ও আদর করিতেন। পক্ষান্তর তাঁহার ব্যক্তিত্ব এবং আত্মসচেতনতা এই ধরনের ছিল যে, তাঁহার সামনে উপস্থিত স্বয়ং রাজ্যের খলীফা পর্যন্ত নিজেকে তাহার নিকট ক্ষুদ্র মনে করিতেন। অথচ হযরত বড়পীর (রহঃ) সাহেব সকলের সাথেই একান্ত বিনয় ও বিনম্র ব্যবহার করিতেন।

ধৈর্য ও সংযম

ধৈর্য ও সংযম তাঁহার মহান চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল এ বিষয়ে তিনি নিজেই বলিয়াছেন যে, কখনও কখনও আমার উপর ইলমে বাতেনের এমন গুরুতর বোঝা চাপাইয়া দেওয়া হইত যে, পৃথিবীর কোন পাহাড় পর্বতের উপর উহা অর্পিত হইলে নিমিষেই তাহা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইত।

স্নেহ-মমতা গাম্ভীর্য

স্নেহ-মমতা ও গাম্ভীর্যের মূর্ত প্রতীক ছিলেন হযরত বড় পীর (রহঃ) সাহেব। তিনি স্বীয় ভক্ত এবং শিষ্য মণ্ডলীকে যেমন মায়া মমতার ডোরে বাঁধিয়া রাখিতেন, তেমনি তাঁহার অকৃত্রিম, অনুপম স্নেহ আকর্ষণে তাহারা তাহাকে মনে প্রাণে ভালবাসিত ও গভীর ভাবে শ্রদ্ধা করিত। এইজন্য ভক্ত ও অনুরক্তগণ তাঁহার সাহচর্যে ও তাঁহার পবিত্র দরবারে উপস্থিত থাকা কালে পরম আনন্দ অনুভব করিত।

সাহসিকতা

তিনি দৃঢ় মনোবল, সৎসাহস এবং নির্ভিকতায় ছিলেন সুউচ্চ হিমাদ্রীর মত। তাহার প্রতিটি কার্যে, কর্তব্যে এবং দায়িত্ব পালনে কখনও অন্যায়ের কাছে মাথা নত করেন নাই। সর্বদা তিনি ন্যায়ের ঝান্ডা উচ্চ রাখিতেন। বাদশাহ বা খলীফাদের কাছে চিঠি পত্র লিখার প্রচলিত রীতি প্রথমে বাদশাহর সীমাহীন স্তুতি, প্রশংসা এবং নিজেকে অধম হইতে অধমের স্তরে অবনমত করা (যাহা বিনয় নহে বরং সৎ সাহসের অভাবজনিত ভীরুতা) হযরত বড় পীর (রহঃ) এই প্রচলনকে খুবই খারাপ মনে করিতেন এবং নিজে এই রীতি হইতে সর্বোতভাবে দূরে থাকিতেন।

দয়ামায়া ও দানশীলতা

হযরত বড়পীর (রহঃ)-এর তুল্য দয়ালু, ক্ষমাশীল এবং দানশীল ব্যক্তি সারা দুনিয়ায় বিরল বৈ কি! তাঁহার দয়ামায়ার কোন সীমা পরিসীমা ছিল না। পরদুঃখ দেখিলে তাহার হৃদয় কাঁদিয়া উঠিত। কাহাকেও বিপন্ন দেখিলে তাহার বিপদ উদ্ধার করিতে তিনি অবিলম্বে ঝাঁপাইয়া পড়িতেন। দানের ক্ষেত্রে তিনি মুক্ত হস্ত ছিলেন। কখনও কোন প্রার্থী তাহার দরজা হইতে বঞ্চিত হইয়া ফিরিয়াছে বলিয়া শুনা যায় না।

শিক্ষা দীক্ষা

ইলমে শরীয়ত এবং ইলমে মারেফাতে তিনি সম যোগ্যতা অর্জন করিয়াছিলেন। আল্লাহ প্রদত্ত তীক্ষ্ণ ধীশক্তি বলেও সমসাময়িক যুগের উস্তাদগণের আন্তরিক যত্নের সাথে শিক্ষা দানের ফলে তিনি শরীয়ত ও মারেফাতের শীর্ষ পর্যায়ের জ্ঞান আহরণে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাহা ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে এবং শাস্ত্রসমূহেও তিনি সুগভীর জ্ঞান অর্জনে নিজেকে সর্বমুখী যোগ্যতার আসনে অধিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ আদব এবং সাহিত্যের ক্ষেত্রে তিনি অপরিসীম পারদর্শিতা অর্জন করিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া ভূগোল, ন্যায়শাস্ত্র, শরয়ী বিধান শাস্ত্র এবং ব্যাকরণ প্রভৃতি বিষয়েও তাঁহার অসাধারণ জ্ঞান ছিল।

গ্রন্থ রচনা

আদব এবং সাহিত্যে তাঁহার অগাধ পান্ডিত্য ও দক্ষতার পাশাপাশি তিনি গ্রন্থ রচনা এবং আরবী ভাষায় কবিতা রচনায় সিদ্ধ হস্ত ছিলেন। কাছীদায় গাওছিয়া ইহার সাক্ষ্য বহন করে। তাহাছাড়া তাহার রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে ফাতহুল গাইব, গুণিয়াতুত্তালেবীন এবং আল্‌ফাতহুর রাব্বানী অত্যন্ত উন্নত মানের গ্রন্থ এবং সারা মুসলিম জাহানে সুপরিচিত।

প্রাত্যহিক ইবাদাত বন্দেগী

হযরত বড় পীর (রহঃ)-এর প্রাত্যহিক ইবাদাত বন্দেগীর পরিমাণ নির্ণয় করা কঠিন। তিনি দীর্ঘ আঠার বৎসর যাবত দৈনিক একবার এক পায় দাঁড়াইয়া পবিত্র কোরআন খতম করিয়াছেন।

আরও কথিত আছে যে, সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসর যাবত এশার নামাযের অজুর দ্বারা ফজরের নামায আদায় করিয়াছেন। এসময় রাত্রের নিদ্রাকে তিনি হারাম করিয়াছিলেন। সাররাত ইবাদাত বন্দেগীতেই কাটাইয়া দিতেন।

ফজরের নামাযের বাদে তিনি কুরআন শরীফ পাঠ করিতেন এবং যিকির আযকার অজিফা ও দোয়া কালাম পড়িতেন। জোহরের নামাযের পর তিনি আল্লাহ তায়ালার পবিত্র নামসমূহ, নবী করীম (দঃ)-এর পবিত্র নাম সমূহ, দরূদে তাজ, দরূদে শিফা এবং দরূদে আকবার কয়েক বার করিয়া পাঠ করিতেন। তাহাছাড়া প্রত্যহ দুইশত রাকাত নফল নামায আদায় করিতেন। প্রত্যহ তিনি চাশতের নামায আদায় করিতেন এবং দোয়ায়ে আজমতে কবীর তিলাওয়াত করিতেন। যিকির আযকার এবং পবিত্র নামসমূহ পাঠ করিবার কালে তিনি কখনও কখনও ধ্যান মগ্নাবস্থায় পার্থিব আবেষ্টনী মুক্ত হইয়া মাকামে আহদানিয়াতের অদৃশ্য জগতে চলিয়া যাইতেন। এভাবে ফানা ফিল্লাহর জগতে বিচরণের পর আবার তিনি মর্তধ্যানে প্রত্যাবর্তন করিতেন এবং সিজদায় পতিত হইয়া আল্লাহর শুকরিয়া জ্ঞাপন করিতেন।

জীবন সায়াহ্ন

একটি অপ্রতিদ্বন্দ্বী সাধনা সমৃদ্ধ সুদীর্ঘ জীবনের সমাপ্তি কাল এইবার বুঝি আসন্ন হইল। পাঁচ শত একষট্টি হিজরী সালের রবিউল আউয়াল মাসে হযরত বড়পীর (রহঃ) সাহেব কঠিন রোগে আক্রান্ত হইলেন। এ সময় তিনি নব্বই বৎসর বয়সে উপনীত হইয়াছিলেন। দিন দিন তিনি দুর্বল হইয়া পড়িতেছিলেন। রবিউছছানী মাসের প্রথম শুক্রবার হইতে অত্যন্ত কাতর হইয়া শয্যা গ্রহণ করিলেন। তাঁহার অসুখের কথা সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িল। দেশ বিদেশ হইতে অসংখ্য ভক্ত, অনুরক্ত, মুরীদ, মুতাকেদীন, সুফী সাধক এবং অলী দরবেশগণ দলে দলে তাঁহাকে দেখিতে আসিতে লাগিলেন। এ সময় তিনি নিজ সন্তান সন্ততি, ভক্তবৃন্দ এবং সর্বসাধারণ মুসলমানকে অন্তিম নছীহত করিলেন। ক্রমশঃ তাঁহার অন্তিম মুহূর্ত ঘনাইয়া আসিতেছিল। প্রভু মাওলার সাথে আশু সাক্ষাত লাভের আনন্দ লক্ষণ তাঁহার চোখে মুখে সৃষ্ট হইয়া উঠিল।

ইহধাম ত্যাগ

এইবার সত্যই দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সাধক রুহানী জগতের উজ্জ্বল ভাস্কর গাউছুল আজম হযরত বড়পীর (রহঃ)-এর জীবন সন্ধ্যা উপস্থিত হইল। রবিবার দিবাগত সোমবার রাত্রে এশার নামাযের সময় হযরত বড়পীর (রহঃ) স্বীয় পুত্রগণকে বলিলেন, তোমরা আমাকে গোসল করাইয়া দাও। গোসলের পর তিনি ধীর স্থির ভাবে এশার নামায আদায় করিলেন। তারপর একটি সিজদায় গিয়া দীর্ঘ সময় কাটাইয়া দিলেন। অতঃপর সিজদাহ হইতে মস্তক উঠাইয়া তিনি বলিলেন, আমি সেই আল্লাহর সাহায্য কামনা করিতেছি, যিনি ছাড়া আর কেহ উপাস্য নাই। তাঁহার নূরানী চেহারায় অনির্বচনীয় দ্যুতি খেলিয়া বেড়াইতে লাগিল। এমনি সময় ফিরেশতা আজ্রাইল আসিয়া তাহার শিয়রে বসিলেন এবং একখন্ড লিপিকা তাহার চোখের সামনে ধরিলেন। উহা পাঠ করিয়া হযরত বড়পীর (রহঃ) সাহেব আনন্দ সাগরে ভাসিতে লাগিলেন এবং আজ্রাইলকে বলিলেন, তুমি তোমার কর্তব্য শীঘ্র সম্পাদন কর। নিজে তিনি কালেমা তাইয়্যেবা পাঠ শুরু করিলেন। আর সেই কালেমা পাঠের সাথে সাথে তাহার পবিত্র রূহ দেহ পিঞ্জর ত্যাগ করিল। "ইন্না লিল্লাহি অইন্নাইলাইহি রাজিউন"।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও সমাধি

মুহূর্ত মধ্যে হযরত বড়পীর (রহঃ)-এর মৃত্যুসংবাদ চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। দলে দলে লোকগণ তাঁহাকে একনজর দেখিবার জন্য ভাঙ্গিয়া পড়িল। মানুষের ভীড়ে কোথাও আর তিল ধারণের ঠাঁই রহিল না। এমনকি মানুষের অত্যধিক ভীড়ে দিবা ভাগে দাফন কার্য সমাধা করা সম্ভব হইল না।

শায়খ হযরত আবদুল ওয়াহহাব (রহঃ) পিতার লাশ গোসল করাইয়া কাফন পরাইলেন এবং তাহা খাটের উপর রাখিয়া দিলেন। অতঃপর দিবাবসানে অধিক রাত্রে লক্ষ লক্ষ মানব পরিবেষ্টিত অবস্থায় হযরত বড় পীর (রহঃ)-এর প্রাণ প্রিয় মাদ্রাসার বারান্দায় তাঁহাকে দাফন করা হইল। তিনি তাহার প্রিয়তম মাদ্রাসা সংলগ্ন স্থানেই চির নিদ্রায় শায়িত হইলেন। সম্ভবতঃ তিনি জীবন কালেও এইরূপ আকাঙ্খা পোষণের কথা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

ঃ তাম্মাত বিল খায়ের ঃ